চিন্তন

কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাভাবনা

অভিজিৎ পাল

ঊনবিংশ শতাব্দীর অখণ্ড বাংলার সবচেয়ে বড় বিস্ময় বোধহয় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। পাশ্চাত্যের জড়বাদী চিন্তাধারা যখন প্রাচ্যের যাবতীয় কার্যকলাপ ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ওপর একটির পর একটি শাণিত প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছিল, তখন সব থেকে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন প্রাচ্য দেশের মানুষেরাই। একের পর এক সংশয় তাঁদের চেতনাকে এমন করে আবৃত করতে আরম্ভ করেছিল যে ভারতীয়রা নিজেদের দেশের সনাতন সংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতিই হয়ে উঠেছিলেন সন্দিহান। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই সংশয়ের সৃষ্টিকালে এমন কোনও ব্যক্তিত্ব প্রাথমিক পর্যায়ে বিকশিত হয়নি, যিনি হাতে-কলমে পুনরায় আমাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে আমাদের মত ফেরাতে পারেন। এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের মধ্য দিয়ে। পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে তাই লিখেছিলেন একটি অপূর্ব কথা : ''সংশয়রাক্ষসনাশমহাস্ত্রং যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যম্।''

ভাববার বিষয়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে-সময়ে জড়বিজ্ঞান বারবার ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের মূল উপড়ে ফেলতে চেয়েছিল, সেইসময়ে ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের ঐশ্বর্যপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ যেন নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নিজেই জড়বাদের বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন! কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে শুরু হওয়া নব্য 'অ্যাকাডেমিক' শিক্ষার মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের পাঠজীবন গড়ে ওঠেনি। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা যে তিনি নিরক্ষর ছিলেন। তা নয়। তিনি নেই নেই করে মোট ছয়টি পুঁথি স্বহস্তে অনুলিখন করেছিলেন। এই পুঁথিগুলি পাওয়া গেছে এবং পুঁথিগুলির শেষে পুষ্পিকা অংশে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যনামের স্বাক্ষর—গদাধর চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু নিজের 'চালকলা আমদানি'র একটি পথ হিসেবে তিনি বিদ্যাকে ব্যবহার করতে চাননি। কথামৃতে যে-বিষয়টি একাধিকবার লক্ষ করা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ঈশ্বরকে জানার নামই জ্ঞান। বস্তুবাদী সমালোচক ও পণ্ডিতবর্গ শ্রীরামকৃষ্ণের পাণ্ডিত্য ও মেধা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা তৈরি করতে পারেননি। কেন পারেননি সেটি ভিন্ন প্রশ্ন। শ্রীম কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ও স্বামী সারদানন্দ মহারাজ রচিত শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত জীবনী 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যার অহংকার

বর্জনের দিকে আলোকপাত করা হয়েছে। ভারতবর্ষে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষাপদ্ধতি চলে এসেছে শ্রুতি ও স্মৃতির ওপর নির্ভর করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ছাপাখানার রমরমা হওয়ার পর স্কুল-কলেজের শিক্ষানীতির পাশাপাশি শিক্ষাপদ্ধতিতে বিপুল পরিবর্তন ঘটে মূলত কলকাতাকে কেন্দ্রে রেখে। ফলে এতকাল ধরে ভারতের মানুষ যে শ্রুতি ও স্মৃতির পদ্ধতিতে শিক্ষাচর্চা করে চলেছিলেন, তার পরিবর্তন শুরু হয়। বলাবাহুল্য শ্রীরামকৃষ্ণের যে-বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার আমরা কথামৃতে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে উদ্ভাসিত হতে দেখি, তারও মূল সূত্রটিতে শ্রুতি ও স্মৃতির পদ্ধতিটি অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ অবলীলায় বলেছেন তিনি 'মূর্খোত্তম'! কিন্তু কথামৃতে যেভাবে বেদবেদান্ত, বিশেষ করে উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত, অজস্র পুরাণ, নারদীয় ভক্তিসূত্র, যোগশাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র থেকে লোককাহিনির চমৎকার সংশ্লেষ শ্রীরামকৃষ্ণের বয়ানে উঠে এসেছে, তাতে বাস্তবিকই তাঁর প্রজ্ঞা ও মেধা সম্পর্কে আর কোনও সন্দেহ রাখা চলে না। এটি শ্রীরামকৃষ্ণের স্ব-অর্জন। লীলাপ্রসঙ্গের 'সাধকভাব' পর্বটি জুড়ে স্বামী সারদানন্দ প্রমাণ করে দেখিয়েছেন অবতার আকাশ থেকে পড়া কোনও নতুন ঈশ্বর নন। তিনিও সাধারণ মানুষ হিসেবেই জন্মগ্রহণ করে নিরন্তর মানসিক ও শারীরিক প্রচেষ্টায় এমন এক সুউচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠিত হন। এই স্তরকে সাধারণ মানুষের কাছে অগম্য মনে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার জগৎ এতটাই ব্যাপ্ত যে, আমরা যারা প্রথাগত শিক্ষাকেই শুধুমাত্র 'শিক্ষিত' ও 'মেধাবী' হওয়ার চাবিকাঠি হিসেবে ভেবে থাকি, তারা শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাপ্ত শিক্ষাভাবনার ধারণাটি শুধুমাত্র স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচির চর্চার জায়গা থেকে ধরতে পারব না। তবুও শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাভাবনার কয়েকটি দিক এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনার বলয়ে দেখা যেতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে-বিষয়টিকে বারবার গুরুত্ব দিয়ে দেখিয়েছেন, সেটি হল আমিত্বের অবসান। কথামৃতে দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজের বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে বলছেন, '' 'আমি ও আমার'—এইটি অজ্ঞান।''[১] আমি এবং আমির বোধ থেকে জন্ম নেওয়া ধারণাগুলি ধীরে ধীরে মানুষকে স্বার্থপর হতে শেখায়। আমি, আমার, আমরা ও আমাদের ক্ষুদ্রতম ধারণার মধ্যে থাকতে থাকতে মানুষের বৃহত্তম আমিত্বের ভাবনাটি নষ্ট হয়ে যায়। এই স্বার্থপর চেতনাটি মানুষের আত্মবিকাশের পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। আমি থেকে তুমিতে পৌঁছনোটি এত লঘু পদ্ধতি নয় যে তা রাতারাতি আমাদের মানসিক অবচেতন স্তরে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিতে পারবে। তার জন্য একটি সরল ও সাধারণ মানুষের উপযোগী পথ দেখিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বলেছেন, ''এই জগৎসংসার রামের [ঈশ্বরের] অযোধ্যা।''[২] অর্থাৎ ক্ষুদ্র আমিত্বের বেড়া ভেঙে যদি ঈশ্বরকে কেন্দ্রে রেখে 'তুমিত্ব'-এর ভাবনার মধ্য দিয়ে মানুষের চেতনায় বিশ্বটিকে বৃদ্ধি করানো যায় তবে এর ফল হবে সুদৃঢ় ও ব্যাপ্ত। আত্মমোক্ষ ও জগতের হিত এখান থেকেই শুরু হওয়া সম্ভব। আত্মপ্রেম শেষ হয়ে গেলে, তবেই তো বিশ্বপ্রেমের অঙ্কুরোদ্‌গম হওয়া সম্ভব। বৈষ্ণবাচার্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতে প্রেমের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, ''কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।'' বৈষ্ণব সাহিত্যে এই কৃষ্ণেন্দ্রিয় হল বিশ্বেন্দ্রিয়। কৃষ্ণময় জগৎ। বিভিন্ন ভাবধারার মধ্যে যে-পারস্পরিক বিবাদ, সেটিও এই ধরনের বৃহত্তর ভাবনা থেকেই মোচন হওয়া সম্ভব। মৈত্রীর মূল সূত্র এখানে ঈশ্বর। এক মাতার একাধিক সন্তানের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে পারস্পরিক বিবাদ তৈরি হতেই পারে, কিন্তু যখন

তারা ঠিক ঠিক অনুভব করে তারা একই মায়ের সন্তান তখন আর সব তুচ্ছ হয়ে একসূত্রে গাঁথা মৈত্রীই বড় হয়ে ওঠে। পাশাপাশি, পরদুঃখে মর্মবেদনা তৈরি না হলে সেই শিক্ষাকে যুগোপযোগী বলা চলে না। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাভাবনার মধ্যে এই যে 'আপন হতে বাহির হয়ে' এসে অন্তরের শুদ্ধীকরণে বিশ্বলোকের তথা ঈশ্বরের অনুভবের ধারণাটি রয়েছে, সেটি আজকের পৃথিবীতে কত বড় প্রায়োগিক একটি শর্ত তা বিশ্বমানচিত্রে বারবার রক্তের দাগ জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাভাবনার এই প্রাথমিক শর্তটি পূরণের জন্য প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের নিজেকে অন্য সবার কাছে prove করার বদলে, নিজের সঙ্গে নিজে আত্মপ্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে improve করা অনেক বেশি প্রয়োজন। আবশ্যিক প্রয়োজন আত্মোন্নতির। অর্থাৎ অপরকে দেখানো নয়, নিজেকে দেখানো, নিজেকে শেখানো। ভালটুকুর নিরন্তর চর্চা এবং চর্চাজাত ভুলগুলি বারবার সংশোধনের মাধ্যমে আরও উন্নত মানের দিকে নিজেকে স্থাপন করা। শিক্ষাবিজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, এর জন্য চাই নিরন্তর অভ্যাস। কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ এই বিষয়টিকে অভ্যাসযোগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ইংরেজি Practice শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হল 'অভ্যাস'। প্রাচীন কাল থেকে একেই সাধনা বলা হয়েছে। বাস্তবিক, যেকোনও সাধনা আদতে practiceই। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান তো এখন সবে বলতে শুরু করেছে 'practice makes perfect', অথচ সেই কতকাল আগে থেকেই গীতায় অভ্যাসের ওপর বারবার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিন্দু বিন্দু অভ্যাস থেকে সিন্ধুসম সাফল্য তৈরি হয়। অভ্যাসের মধ্য দিয়েই আমাদের চর্চার জগৎ এক পা এক পা করে পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। রাতারাতি সবটুকু পরিবর্তিত হয় না। তা সে আধ্যাত্মিক সাধনার পথ হোক বা প্রথাগত শিক্ষার পথ। এই অভ্যাস সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি চমৎকার কথা বলেছেন।

''প্রিয়—মন যে আমার বশ নয়।

''শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি! অভ্যাস যোগ। অভ্যাস কর, দেখবে মনকে যেদিকে নিয়ে যাবে, সেইদিকেই যাবে।

''মন ধোপাঘরের কাপড়। তারপর লালে ছোপাও লাল—নীলে ছোপাও নীল। যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যাবে।''[৩]

অভ্যাসের মাধ্যমে উৎকর্ষ লাভের এই পদ্ধতিকে শ্রীরামকৃষ্ণ শুধুমাত্র তাত্ত্বিক বয়ানেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। কথামৃতে দেখা যায় ১৮৮২-র ১৫ নভেম্বর তারিখে তিনি গড়ের মাঠে উইলসনের সার্কাস দেখতে গিয়েছিলেন। বিভিন্ন খেলার মধ্যে একটি খেলা তাঁকে বিশেষ করে আপ্লুত করেছিল। ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে বিবির স্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়ে থাকা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং একইসঙ্গে বুঝেছিলেন এর পিছনে কতটা অভ্যাস আছে। অভ্যাসযোগ মানুষকে কোন সুউচ্চ জায়গায় নিয়ে যায়, পরে সকলের কাছে তিনি এই প্রসঙ্গটি বলে ব্যাখ্যা করেছেন। ''রোজ অভ্যাস করতে হয়। সার্কাসে দেখে এলাম ঘোড়া দৌড়ুচ্ছে, তার উপর বিবি একপায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কত অভ্যাসে ওইটি হয়েছে।''[৪]

শ্রীরামকৃষ্ণ অভ্যাসযোগকে ঈশ্বরলাভের একটি সোপান হিসেবে দেখিয়েছেন। কিন্তু এই ঈশ্বরলাভের ধারণাটি তিনি জপতপ, পূজা-আচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। অবশ্য বিষয়বস্তুকে সরলভাবে উপস্থাপনা শ্রীরামকৃষ্ণের একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য। তাঁর দৃষ্টিতে ঈশ্বরলাভ হল সাধকের সিদ্ধ হওয়ার শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি, অর্থাৎ শিক্ষাভূমিতে যাকে বলা হয় পরিপূর্ণতা। প্রচলিত অর্থে সীমাবদ্ধ রেখে

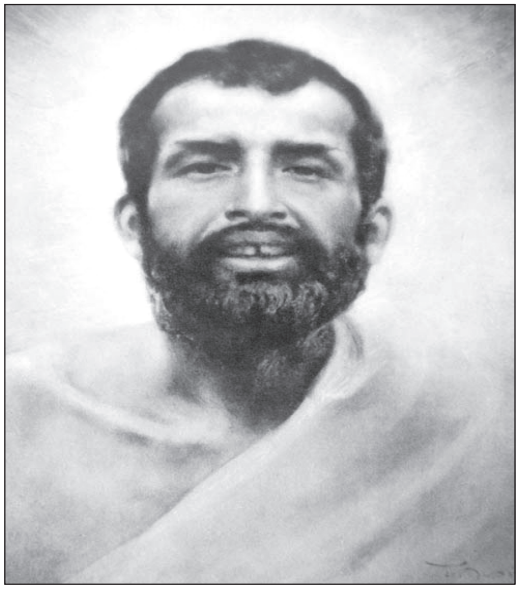

ফ্রাঙ্ক ডোরাক অঙ্কিত শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্র

শ্রীরামকৃষ্ণ এই ঈশ্বরলাভের বিষয়টি যে ভাবেননি তার প্রমাণ কথামৃতেই রয়েছে। তাঁর এই ধারণাটি অনেক বেশি প্রায়োগিক ক্ষেত্র নিয়ে রয়েছে। অভিনেতা ভোলানাথ বসুকে (যিনি কথামৃতে বিদ্যাসুন্দর পালার অভিনেতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন) শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, ''যদি কেউ গাইতে, বাজাতে, নাচতে, কি একটা কোন বিদ্যাতে ভাল হয়, সে যদি চেষ্টা করে, শীঘ্রই ঈশ্বরলাভ করতে পারে।''[৫] ভোলানাথ বসুকে তিনি বলেননি শিল্প ছেড়ে দিয়ে যোগাসনে বসে মালা জপে গেলেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনো যায়। শিল্পী যেন শিল্পকেই সাধনা করে তুলতে পারেন, সেই বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। একাগ্রতা ধীরে ধীরে মানুষকে এইভাবে তৈরি করে।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রায়োগিক শিক্ষাভাবনার এটিও একটি বিশেষ দিক। আজও অজস্র মানুষ ভাবেন যে-বিদ্যা অর্থকরী নয়, যে-বিদ্যার প্রায়োগিক ক্ষেত্র এই দেশে সীমাবদ্ধ, সেই ধারার বিদ্যাচর্চায় মনোনিবেশ করা হল এক প্রকারের পণ্ডশ্রম! প্রথাগত শিক্ষার বাইরে যে-বৃহত্তর শিক্ষার জগৎ রয়েছে সেখানেও সমান উৎকর্ষতা লাভ সম্ভব। এরপরও সংগীত, নৃত্য, নাট্য, চারুকলা বিদ্যার ধারায় উচ্চশিক্ষায় ব্রতীর সংখ্যা কম! অথচ ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণ অনায়াসে এই পথকেও গ্রহণযোগ্যতা প্রদান করতে চেয়েছিলেন। বহু শিল্পী আছেন যাঁরা মনে করেন নৃত্য, সংগীত সবই সাধনা—সরস্বতীর উপাসনা। এঁরা তো সত্য, শিব, সুন্দরের উপাসক। এই পথেও সিদ্ধ হওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের এই শিক্ষাভাবনাটি সেদিক থেকে অনেক বেশি ব্যাপ্ত ও আধুনিক জীবনের বার্তাবাহক। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাভাবনায় শিক্ষার্থীদের ডিগ্রির quantity-র চেয়ে চর্চার quality বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় quantity-র চেয়ে quality-কেই শিক্ষার মাপকাঠি হিসেবে দেখতে চাইছে। কিন্তু তার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। বহু আগে থেকেই ভারতবর্ষ অনায়াসে এই quality-কে গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। রামায়ণ ও মহাভারতে নায়কদের বিদ্যালাভের দৃশ্যগুলি এই ক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে, আত্মোন্নতি লাভ এই quality থেকেই তৈরি হওয়া সম্ভব। কারণ এর মধ্যে আত্তীকরণের প্রাচুর্য থাকে। উৎকর্ষলাভই এর সার কথা।

শিক্ষাবিদ শ্রীরামকৃষ্ণ আর একটি বিষয়ও খুব দরদ দিয়ে দেখেছেন, যাকে আজকের দিনে আমরা সহিষ্ণুতা বলে থাকি। এর প্রধান সুর হল বহু বৈচিত্র্যকে ঐক্যবদ্ধ করে, বিপরীতকে সমান গুরুত্ব, মর্যাদা ও মান্যতা দেওয়া। কিন্তু আধুনিক সভ্যতায় দেখা যায় বস্তুবাদ ভাববাদের সবটুকুই অস্বীকার করতে চায়, আর ভাববাদ বস্তুবাদের সবটুকু ভ্রান্তি হিসেবে চিহ্নিত করতে চায়। ফলে বৈচিত্র্যের পরিবর্তে তৈরি হয় পারস্পরিক দ্বন্দ্ব। এবং তা কখনই

কথামৃতকার শ্রীম

আধুনিক পৃথিবীতে কাঙ্ক্ষিত নয়। বস্তুবাদ ও ভাববাদ উভয় মতবাদেই কিছু ভ্রান্তি রয়েছে আবার সুউচ্চ সারকথাও রয়েছে। দুটি পথই সত্য, দুটি দার্শনিক ভিত্তিরই গুরুত্ব রয়েছে। একটির প্রতি একনিষ্ঠ উগ্র আনুগত্য প্রকাশ করতে গিয়ে অন্যটিকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দেওয়া যায় না। যদি তার বিপরীত হয়, তবেই জন্ম নিতে শুরু করে উগ্রতা ও উগ্রবাদী মনোভাব। যা থেকে জন্ম নেয় বিভেদবোধ। উগ্রতা ভাববাদ ও বস্তুবাদ উভয় মতবাদেরই পরিপন্থী। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাভাবনার অন্যতম শর্তই এই। তিনি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য চান। তাঁর ভেতরে যে-অসাধারণ পর্যবেক্ষণদক্ষতা ছিল, এটি আসলে তারই কণামাত্র প্রকাশ। কোনওরকম একঘেয়েমি তাঁর পথ দূষিত করতে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ এই জন্যই সর্বজনীন। কথামৃতের বিভিন্ন দিনে তাঁর কাছে গোঁড়া বৈষ্ণব এসেছেন, শাক্ত তান্ত্রিক এসেছেন, অদ্বৈতবাদী এসেছেন, এসেছেন ব্রাহ্ম, এমনকী নাস্তিকও। শ্রীরামকৃষ্ণের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল : ''একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হল।... তবে এ-বুদ্ধি করো না যে, এইটি কেবল সত্য আর সব মিথ্যা। এইটি জেনো যে, নিরাকারও সত্য আবার সাকারও সত্য। তোমার যেটি বিশ্বাস, সেইটিই ধরে থাকবে।''[৬] কথামৃতের এই অংশে শ্রীমও শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথাটি সম্পর্কে একটি চমৎকার ও অভূতপূর্ব মন্তব্য করেছেন, ''মাস্টার দুইই সত্য এই কথা বারবার শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। এ-কথা তো তাঁহার পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে নাই।''[৭] হাতের পাঁচটি আঙুলের মতো পাঁচটি মানুষও এক নয়। নিজের মতো করে চেতনাকে সাজিয়ে তোলার স্বাধীনতা মানুষের অধিকার। বহু থাকবে, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যও থাকবে। এতেই স্বাভাবিক লোকব্যবহার বজায় থাকে। শুধু তার মধ্যে অযথা অনর্থক বিবাদ থাকবে না। জন্ম নেবে সহিষ্ণুতা। এই ঐক্যে বিশ্বাসী হওয়াটা জরুরি। আত্মমগ্ন জীবনের বাইরে এসে পরার্থপরতার জীবনবোধ তৈরি না হলে শিক্ষার প্রায়োগিক ক্ষেত্রটিই নষ্ট হয়ে যায়। ✠

তথ্যসূত্র

১। দ্রঃ শ্রীম, '*শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*', অখণ্ড, (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০১৩), পৃঃ ৫৭৯
২। তদেব, পৃঃ ৬৮৬
৩। তদেব, পৃঃ ৫৫৪
৪। তদেব, পৃঃ ১৩৯
৫। তদেব, পৃঃ ৪২৭
৬। তদেব, পৃঃ ১৮
৭। তদেব